# বোরিস পাস্টেরনাকের কবিতা

কথামখ অনবাদ : রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

## ইভ
(Eve)

উইলো নিথর, জলের কিনারে,
উঁচু পাড় ক্রমে তড়াগে নাবাল,
সূর্য তুঙ্গে—ছোঁড়ে জলাধারে
পেঁজামেঘ, যেন ধীবরের জাল।

ডুবে নভোজাল তড়াগের জলে,
ফুকরে ঝাঁপায় রোদে-পোড়া লোক,
আকাশের ওই মায়ার অতলে
চায় সকলেই শির নত হোক।

মহিলারা কেউ জল থেকে উঠে
উইলো-আড়াল যতটুকু পায়,
বালিপথে যেতে পদছাপ ফুটে,
স্নানের পোশাক দ্রুত নিংড়ায়।

জোলোসাপ যেন পোশাকের পাক—
নম্য, পিছল, অবাধ চকিতে,
কপট সাপকে সিক্ত পোশাক
লুকিয়েছে তার ভাঁজের নিভৃতে।

দৃষ্টি কিংবা অবয়বে, নারী,
হব না বিমূঢ়, ধূর্তনজর,
আবেগাপ্লুত গলায় আমারই
দলার মতন তোমরা নাছোড়।

ও চোখে তোমার মুসাবিদা যেন—
পদ্য সে কাটাকুটির আখরে,
তাহলে কথাটা সত্যি এহেন—
তোমার সৃষ্টি আমার পাঁজরে।

অচিরে আমার বন্ধন ছেড়ে
যেদিন গড়েছ সমূহ ফারাক,
ভয়, দ্বিধা, গোলযোগ তার জেরে—
পুরুষের প্রাণস্পন্দেও ফাঁক।

(১৯৫৬)

## অন্তরাত্মা
(Soul)

আছ শোকে, বিবশ অন্তর, কর খেদ—
চিরঘুমে আছে যত দোসর আমার;
ওদের সমাধিঘর হয়ে থাকো আজ,
শিকার তো সকলেই বহু লাঞ্ছনার।

ওদের স্মরণে লেখা কবিতা এখন
ওদেরই উপর যদি সুগন্ধ ছড়ায়—
সে লেপন যন্ত্রণায়, দারুণ ভাঙনে,
বিলাপেও তার কিছু স্নেহ রয়ে যায়।

আমাদের এই নীচ, স্বার্থপর কালে,
মর্মতাড়নায় কোনো থাকো অন্বেষণে,
অস্থিগুলি রক্ষা করো—হও শান্তিনীড়,
আত্মার প্রশান্তি হোক ওই নিকেতনে।

ওদের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা তোমায়
আনত করেছে আজ মাটিতে যখন,
নাও ঘ্রাণ ধুলো থেকে, মৃত্যুক্ষয় থেকে,
শবাগার, সমাধির স্তূপেরও এখন।

বিষাদে বিবশ হয়ে, কাঙাল অন্তর,
শোনা আর দেখা সব পূর্ণ হল যত,
মনে রেখে পূর্বাপর, মিশিয়ে সেসব
করো তাকে মোলায়েম যন্ত্রবিধিমতো।

অবিরাম হয়েছে যা পেষণে-মিশ্রণে—
এড়ায়নি সেইসবও আমার নজরে,
গোরস্থান ক্রমে যত যৌগ হতে থাকে,
তুমিও করেছ একই চল্লিশ বছরে।

(১৯৫৬)

## অমল আবহে
## (When It Clears Up)

এই হ্রদ যেন এক পরাত, বিপুল;
দূরপ্রান্ত ঘেঁষে তার মেঘ দলে দলে,
দুর্জয় হিমাদ্রি ঘিরে তুহিন-উজ্জ্বলে
স্তূপ তুলে আছে তার ওই ঘনকুল।

তর-তম হয় যেই আলোর কিরণে,
নিসর্গ তখনই তার আকর্ষে বিবশ—
এইমাত্র ছায়া হলে সবই মলীমস,
পরেই সে বন যেন জ্বলে হুতাশনে।

বর্ষাদিন শেষ হলে আবার যখন
গুরুভার যবনিকা ঊর্ধ্বে উঠে যায়,
কী ধুম পড়েছে ওই গগনসভায়!
বিজয়ের কী উল্লাস তৃণেও তখন!

বায়ু শান্ত হলে, দূর অমল দৃশ্যত,
রোদ ঝলে ঘাসে ঘাসে চতুর্দিকব্যাপী,
আতপ্ত পল্লব থাকে অনচ্ছ তথাপি—
কাচে-আঁকা চিত্রে সব প্রতিমার মতো।

গির্জাঘরে সেরকমই শীর্ণ ঝরোকায়
বিনিদ্র প্রহরে আলো-আঁধারির ছবি—
সন্ত, সাধু, তাজধারী লোকপাল সবই
স্থিরদৃষ্টি মেলে আছে দূর তারকায়।

বিপুল এ চরাচর সাধনমন্দির—
এরই মাঝে দাঁড়িয়েছি, প্রশান্ত বাতাসে,
স্তবগান কখনো-বা দূর থেকে আসে,
শ্রুতি তারই প্রতিধ্বনি পেয়েছে গভীর।

নিখিল, হে সৃষ্টিধর, জগৎকারণ,
নিভৃত শিহর জাগে, আমার যে গতি
তোমার সকল কাজে থেকে নিরবধি,
জানি, অশ্রু দিয়ে হবে সে সুখসাধন।

(১৯৫৬)

## জুলাই
## (July)

সারা বাড়িজুড়ে বেতালের চলাচল।
উপরতলায় অবিরত পায়চারি।
দিনভর ছায়া চিলঘরে চঞ্চল।
পেঁচোয় পেয়েছে রীতিমতো সারা বাড়ি।

চলনপথেই বেআক্কেলে যে ঠায়,
আপনি মোড়ল, জ্বালাতনে ওস্তাদ,
গাউন ধরে সে চুপিসারে বিছানায়,
টেবিল ক্লথটা করে দিলে বরবাদ।

পাপোশে মোছে না কখনোই শ্রীচরণ,
দমকা হাওয়ায় নর্তনে তৎপর—
পর্দা পাকিয়ে সিলিঙেই বিহরণ,
যেন কুর্দনে সে নবিশ নটবর।

কে এই ভূতের আওলাদ, উজবুক,
এই যে বিদেহী, অপচ্ছায়া সে কার?
আমাদের সাথে করতে সে কৌতুক
গ্রীষ্মে হয়েছে অতিথিও এই বার।

ছুটি গুজরানে ক-টা দিন বাড়িময়
তারই রমরমা চলছে যা রীতিমতো,
জুলাইয়ের সাথি ঝোড়ো হাওয়া যত বয়,
বাড়িভাড়াটাও নিয়েছে সে কার্যত।

জুলাই আনলে কাঁটাগাছে বীজ, আর
পোশাকেও লেগে চোরকাঁটা ছয়লাপ;
সব জানালাই জুলাইয়ে যখন দ্বার,
ফুলঝুরি হয়ে ফোটে তার সংলাপ।

স্তেপাঞ্চলের নোংরা হতচ্ছাড়া,
লেবু, রাই আর গন্ধভরা যে ঘাস,
বিটপাতা আর মৌরিগন্ধে ভরা,
বুনোফুলঘ্রাণে এসেছে জুলাই মাস।

(১৯৫৬)

# রাত্রি
(Night)

রাত বাড়ে, রাত্রিও যায় ক্রমে ফুরিয়ে,
ফের দিনজন্মের জন্য।
চালক সে দূরগামী ব্যোমযান উড়িয়ে,
নীচে তার মর্ত নিষণ্ণ।

আর সেও বিলকুল মেঘে ঢাকা পড়লে
স্ফুলিঙ্গ হয়ে উৎকীর্ণ,
যেন এক তির্যক টুনিফোঁড় হয়ে সে,
ধোবিহাতফেরতার চিহ্ন।

নীচে তার কতসব অজ্ঞাত জনপদ,
রাজপথ গিসগিস করছে,
নৈশিক মজলিশ, যোধাবাস, রেলপথ,
ইন্ধন জোগানও তো চলছে।

তার দুই পক্ষের সুবিপুল বিসারে
ঘন ছায়াসম্পাত জলদে,
ভিড় করে তার পাশে ওই পথবিহারে
অম্বরচারী আরও যায় ধেয়ে।

শোনা যায় ভয়ানক শব্দ কী ওখানে—
দূর ওই নিঃসীম শূন্যে,
কোন রবিমণ্ডল থেকে তার কে জানে,
ছায়াপথ ঘুরে সব হন্যে।

সীমাহীন বিস্তারে ভূভাগের শেষপাদ
লীন হয়ে আছে, খর দীপ্ত।
তয়খানা, ভাঁড়ারের তদারক সারারাত
কর্মের চক্রেই লিপ্ত।

আর নীচে ছাদ এক ওই পারি শহরে,
সেইখানে কোনো উৎকীর্তন,
মঙ্গল, হয়তো-বা বেস্পতি নজরে
পড়ে হালফিলে হওয়া প্রহসন।

আর এক চিলেকোঠা—মনে হয় সুপ্রাচীন
স্লেটে-গড়া ছাদ ওই, সেখানে
বিনিদ্র কেউ তাঁর কর্মেই সমাসীন,
উন্মুখ চিন্তায়, ধেয়ানে।

গ্রহে তাঁর দৃষ্টিও হয়ে আছে অপলক,
যেন ওই দ্যুলোকের সব দায়
নিয়েছেন অমরার বিশ্বাসী রক্ষক,
রাত ভোর হয় তাঁরই প্রহরায়।

ঘুম যদি হানা দেয় যুঝবে তা জাগরে,
চাই কাজ, ঠিক যেন পড়ে পা,
দৌবাসী তারাদের জাগ্রত নজরে
চালকের বিচরণও হয় যা।

কাজ করো, চাই কাজ, সর্জনগুণী হে,
ঘুমে এত জমে ওঠে অন্যায়—
নিত্যের ঘরে তার অতিথিও তুমি যে,
সময়ের কারাগারে দিন যায়।

(১৯৫৬)

# পবন
# (The Wind)

(আলেকজান্ডার ব্লক প্রসঙ্গে চার কণিকা)

১.
কদর কে পাবে আর টিকে যাবে কে-বা অবশেষে,
হবে কার অনাদর, মুছে যাবে কারই-বা জীবন,
কেউ তা জানে না আজ আমাদের দেশে,
উপরতলার সায়ে ধামাধরা বাবুরা না বলে যতক্ষণ।

মান্য হবে পুশকিন, কি জুটবে না কুর্নিশ,
জোর দিয়ে বলা যায় সবার কাছেই অবিদিত,
কেউ তো লেখেনি আর এই নিয়ে তুখোড় থিসিস,
আমাদের অন্ধকারে তাহলে হয়তো আলো দিত।

কিন্তু ব্লক, ধন্য হে নির্জর, অসামান্য, আর
বরাত ভালো যে তবু এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে।
সিনাই থেকেও তিনি অবতীর্ণ হননি, আবার,
প্রতিপালনের দায় থাকবে যে আমাদের মাঝে।

রেয়াত করে না কিছু তাঁর যশ, কিছুরই নির্ভর
করে না কোথাও কোনো পাঠ্য সব শিক্ষায়তনের।
মূর্খের যে-হাত করে আমাদের কণ্ঠরোধে ভীষণ জর্জর—
গড়া নন তিনিও সে-মানুষের হস্তাবলেপনে।

২.
তিনি মুক্ত পবনের মতো, যে-পবন
রাজপথে সরবে তুমুল হেঁকে যায়,
যখন ঘোড়ার দলে ত্বরিত গমন
পুরোযায়ী সহিসের ক্ষিপ্র তাড়নায়।

আর সেই পিতামহ জীবিত তখন—
জ্যাকোবিন, স্বচ্ছপ্রাণ স্ফটিক সদৃশ,
পৌত্রটিও তাঁর মূর্তিমান প্রভঞ্জন,
একই ছাঁচ—উনিশ যা, গড়া তাতে বিশও।

পাঁজরবিদারী সেই পবনই আবার
আত্মায় সিঁধোলে পর সময়প্রবহে
কবিতায় এলে হয় সুরের সঞ্চার,
অমল দিনের কিংবা খারাপ আবহে।

সর্বগামী সে-পবন—বহু বাড়িঘর,
বৃক্ষ, গ্রাম, বাদলেও; তার আগমন
কবিতার তৃতীয় সংগ্রহে, অতঃপর
'দ্বাদশ'এও, তিরোধানে—আছে সে-পবন।

৪.

দিগন্ত ক্ষুরধার, তারই এক সন্ত্রাসে
আহত যে-গোধূলি—দেখাচ্ছে সে-ই তো
জখম কী ভয়ানক, যেন খেতমুনিশের
জঙ্ঘার কাটা ঘায়ে শুকোয়নি রক্ত।

আকাশের অগণন ক্ষতমুখে ছেয়ে আছে
আসন্ন ঝঞ্ঝার, বিনাশেরও সংকেত,
আর জলাবাষ্পের গন্ধেও রয়ে গেছে
লোহা, জল, মরিচার ভরপুর সংস্রব।

জঙ্গল, জনপদ, নালা আর খালিজুলি,
দেশগ্রাম, খেতিজমি—খামারের ওপরেও
কণ্টকী বিদ্যুৎ অনাগত ঝঞ্ঝার
লক্ষণ মেঘে মেঘে করে উৎকীর্ণ।

যখন সে আশমান ঘিরে ফ্যালে জনপদ
জং-রঙা বেড় দিয়ে, তখনই তো মস্তক
নোয়ানোর মতো হাল হয়ে ওঠে সকলের,
স্থলভাগ ছায়াময় সমুদ্রঝঞ্ঝায়।

দেখেছেন ব্লক ওই আশমানে কী লিখন।
দ্যুলোকের বাণীতেই ছিল তার অর্থ,
দুর্যোগী মেঘে মেঘে বজ্র ও বৃষ্টিতে
বিপুল এক ঝঞ্ঝাই হবে ঠিক সমাগত।

প্রবল সে আলোড়নই প্রতীক্ষা ছিল তাঁর।
অর্চির স্বাক্ষর কীর্ণ যে-নকশায়—
পরিণামে থাকে যার শঙ্কা ও প্রত্যাশা,
জীবনেও একই সেই—ছিল তাঁর কবিতায়।

(১৯৫৬)

৩.

যতদূর চোখ যায় নদী আর প্রান্তর
অবারিত; বোঝা ভার হচ্ছে কী চারপাশে,
গুচ্ছের খড় বেঁধে চলছে যা তোলপাড়।
জলের ওই কিনারায় মুনিশরা তৎপর,
ফসলের সারি বিনা আরপানে নেই চোখ।
দেখে ব্লক ভাবলেন কর্তনই করা যাক,
অমনি সে দুলালের ছেনতাই কাস্তে,
আর ছুঁড়ে যেই কোপ—একটি যে শল্লকী
একটুর জন্যই হাতছাড়া হল, আর
বিষধর দুটি হল খণ্ডনে অর্ধ।

বাড়ির পাঠকর্ম যে তার সদাই অসমাপ্ত।
'আলসে বড়ো!' তিরস্কারই জোটায় ফাঁকিবাজ।
বাল্য! কী যে বিরক্তিকর ব্ল্যাকবোর্ড, চকখড়ি।
জোতের কামিন, চাকরবাকর গাইতে থাকে গান!

পুবদিক থেকে মেঘ ধেয়ে আসে সন্ধ্যায়।
উত্তর দক্ষিণ তমসাচ্ছন্ন।
অসময়ে বর্বর পবনের ঘূর্ণি
আচমকা পৌঁছেই সংঘাতে জর্জর
করে তোলে কাস্তে ও শরবনে হামলায়,
তীরভূমি জুড়ে ওঠে উন্মদ উচ্ছ্বাস।

বাল্য! কী যে বিরক্তিকর ব্ল্যাকবোর্ড, চকখড়ি!
জোতের কামিন, চাকরবাকর গাইতে থাকে গান!
চোখ চলে যায় যতই দূরে, সেই দিকে বিস্তর
বইছে নদী, অবাধ হয়ে সেইখানে প্রান্তর।

## বয়ে গেছে হিমঝড়
## (After The Blizzard)

বয়ে গেছে হিমঝড়, তেজ নেই আর,
আজ তাই চারপাশ প্রশান্ত এখানে।
নদীর ওপারে শিশু মুখর আবার—
ওদেরই খেলার শব্দ আসে তাই কানে।

না, ঠিক তা নয়, ভ্রম নিশ্চিত আমার,
ভ্রমান্ধ, বিপথে হয় একক ভ্রমণ,
প্লাস্টার-ধবল কোনো মৃত মহিলার
মতো এই শীত এসে শয়ান এখন।

আকাশও যে মান্য করে চোখের পল্লব
জুড়ে গেলে সেরকমই থাকবে সতত;
তুষারশাসনে শাখা, প্রাঙ্গণ, পাদপ,
তুহিন সে তেউড়েও হয়নি বিরত।

রুদ্ধ নদী, পারাপার, প্ল্যাটফর্ম আর
রেলপথ, বনাঞ্চল, নদীবাঁধ, তাও
তুষার-ছাঁদেই সব নিখুঁত আকার—
নেই ছুট, কিংবা কোনো ফাটল কোথাও।

যখন রাতের বেলা থাকি নিদ্রাহীন,
সুখাসন টলে যদি কোনো মহিমায়,
পূর্ণ হয়ে ওঠে সব স্তবক সেদিন,
নিখিলভুবন ধরে একক পৃষ্ঠায়;

কাণ্ড, মূল যেরকম তুষারে খোদাই,
গুল্মেও প্রকাশ তার নদীর কিনারে,
ছাদে ছাদে সিন্ধুছবি পত্রে এঁকে যাই,
শহর, জগৎ ছায় তুষারে তুষারে।

(আনু. ১৯৫৬)